Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী নজরুল ইসলামের ‘জাতীয় শিক্ষা’র স্বরূপ

Volume	60
Issue	1-2
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Jashim Uddin
Published online	August 20, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i1-2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.4
Pages	57-71
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.4
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৫৭-৭১

কাজী নজরুল ইসলামের 'জাতীয় শিক্ষা'র স্বরূপ

মো. জসিম উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: jashim.bangla@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলামের প্রায় সকল প্রবন্ধই রচিত হয়েছে কালিক প্রয়োজনে বা তাগিদে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ শিক্ষাব্যবস্থায়ও লেগেছিল। সে প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও অভিভাষণে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থাকে বাতিল করে 'জাতীয় শিক্ষা' বিষয়ক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নজরুল। এ সকল রচনায় তিনি দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে আমাদের জাতিসত্তা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আমাদের মনে-প্রাণে প্রোথিত করে দিচ্ছে। তাই নজরুল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আমাদের 'জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা'র উপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি 'জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা' বাস্তবায়নে পূর্বের ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে সঠিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে নজরুলের তৎকালীন 'জাতীয় শিক্ষা'-ভাবনার স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

জাতীয় শিক্ষা, *নবযুগ, যুগবাণী,* শিক্ষাভাবনা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নারী শিক্ষা, শিক্ষার উদ্দেশ্য, ঔপনিবেশিক শিক্ষা, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিত মূলত কবি পরিচয়ে। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত প্রভৃতি অঙ্গনে নজরুলের অবদান চিরস্মরণীয় হলেও প্রাবন্ধিক হিসেবে কিছুটা ম্রিয়মানই বলা যায় তাঁকে। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশের অব্যবহিত পরে ১৯২০ সালে তিনি যোগ দেন সান্ধ্য *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই তখন তাঁর দীপ্ত পদচারণা। এই এক দশকে তিনি *নবযুগ* ছাড়াও অর্ধসাপ্তাহিক *ধূমকেতু*, সাপ্তাহিক *লাঙ্গল* ও *গণবাণী* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সকল পত্রিকায় নজরুলের লেখা সম্পাদকীয় পরবর্তীকালে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় *যুগবাণী* (১৯২২), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬) গ্রন্থে।

সমাজসচেতনতা ও কালিক প্রয়োজনে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনার তাগিদে প্রবন্ধ রচনা করলেও কবিসত্তার আবেগধর্মে বিষয়-সংলগ্নতার সূত্রে কবিতার মতোই তাঁর প্রবন্ধেও সংগ্রথিত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে জাতিক-আন্তর্জাতিক পুরাণ-ঐতিহ্য-ইতিহাস ও লোকজ কথামালা (আবু হেনা ২০১৭: ১৯৭)। নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে মূলত সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও ঔপনিবেশিক কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা ও সমাধান, রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও ঔপনিবেশিক নিপীড়ন প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব চালচিত্র ও সংস্কার নিয়েও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। স্বল্পসংখ্যক ও স্বল্পায়তনের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে নজরুলের ‘জাতীয় শিক্ষাভাবনা’, যা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক।

এক

সাহিত্যজগতে নজরুলের আবির্ভাব এক উত্তাল সময়খণ্ডে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪), খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) প্রভৃতি ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন এক উত্তাল-ঊর্মিমুখর ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে ভারতীয় উপমহাদেশ, সেই সময়ে যুদ্ধফেরত সৈনিক কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যজগতে আবির্ভাব ধূমকেতুর মতোই আকস্মিক। *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে নজরুল যেন ‘নব যুগের’ই বার্তা দিচ্ছিলেন! শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর মুক্তির প্রেরণায় ঔপনিবেশিক শোষক সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে কলম তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই সম্পাদকীয় রচনাগুলোই পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাকারে। বিশুদ্ধ নান্দনিক প্রযত্নে নয়, নজরুল প্রবন্ধ লিখেছেন প্রধানত দেশ-কাল, পরিবেশ ও কর্মজগতের প্রণোদনায়। পরাধীন দেশের যন্ত্রণা, স্বসমাজ ও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান সত্ত্বেও উপজাত সমস্যা-সংঘাত, ধনবান-ধনহীনের বৈষম্য, অশিক্ষা-কুসংস্কারের প্রবল পীড়ন এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁর সত্যসন্ধ স্পর্শকাতর হৃদয়ে যে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল, প্রবন্ধসমূহে তার স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময় বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় (সিদ্দিকা ২০১৭: ২০০)। নজরুলের এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনার অভিপ্রায় সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেন:

> ... নজরুল ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন রুদ্ররোষের দ্রোহকণ্ঠ। সচেতন রাজনীতিজ্ঞানচৈতন্যের অভিনিবেশে নজরুল স্বকালের জাতিক-আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-আন্দোলন-আলোড়ন-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-দুর্বলতায় তাঁর প্রাণস্পর্শী লোকায়ত-পৌরাণিক-আবেগিক শব্দরূপের গতিসংযোজন-সামর্থ্যের বেগে-ভাবাবেগে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে আঘাতে-আহ্বানে জাতিকে যুগের নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি এই যুগকে 'মহাজাগরণের'; 'মহাআনন্দের' এবং 'মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন' বলে বিবেচনা করেছেন। (আবু হেনা ২০১৭: ১৯৮)

জাতির এই নবজাগরণের আহ্বানে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থারও আমূল সংস্কার-নবজাগরণ প্রত্যাশা করেছেন তিনি। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার ঘোরবিরোধী ছিলেন নজরুল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ঔপনিবেশিক শেকল থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার সত্যিকার সংস্কার সাধন করা। তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', 'সত্য-শিক্ষা', 'ভাব ও কাজ' ইত্যাদি প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলো *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকায় সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে *যুগবাণী* গ্রন্থে। পাশাপাশি সমকালীন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণগুলোতেও নজরুলের শিক্ষাসম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই

পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকদের ভারতে আনাগোনা শুরু হয়। পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদের আগমনের অব্যবহিতকাল পরেই ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে বৃটেনের রানি এলিজাবেথের অনুমতি নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে পদার্পণ ঘটে। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তারা ভারতে এলেও একসময় তারা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এ দেশের শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়। শুরু থেকেই ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান পাদ্রি ও মিশনারিদেরও আগমন ঘটে এ দেশে। ভারতবর্ষে প্রথম ইউরোপীয় ভাবধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে পর্তুগিজ মিশনারিরা। ভারতীয়দের বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি এ সকল প্রতিষ্ঠানে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করা হতো। এ সময়ে পর্তুগিজদের পাশাপাশি ফরাসি ও ইংরেজরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ সকল স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছানোর আড়ালে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচার করা। পরবর্তীকালে অবশ্য ধর্মপ্রচার গৌণ হয়ে পড়ে; কারণ তখন শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনে দেশীয় কেরানি সৃষ্টি করা। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেন:

> সতেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচার উপলক্ষে মিশনারিদের উদ্যোগে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় শিক্ষার এক জাগরণ ঘটে। ভারতীয় ঘরানার টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসার পাশাপাশি ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক ধারার শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে মিশনারিদের এ উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছিল। কিন্তু ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি মিশনারিদের পথ থেকে সরে আসে। তারা মনে করেছিল মিশনারিদের শিক্ষার সাথে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা

> স্থানীয়দের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা তাদের শাসন ও বাণিজ্যের পথে বিপত্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে। দ্বিতীয়ত, তখন মিশনারি ও কোম্পানির শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কোম্পানির তখন খ্রিস্টধর্ম প্রচার নয়, দেশজ কর্মচারী কেরানি সৃষ্টির দরকার হয়ে পড়ে। কোর্ট-কাচারির কাজে হিন্দু-মুসলিম আইনের ব্যাখ্যাকার প্রয়োজন হয়। (শোয়াইব, ২০২৪: ১৪)

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পশ্চিমা শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি রেনেসাঁর চেতনা-প্রভাবিত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির মাধ্যমে প্রথমে ধর্মপ্রচার ও পরবর্তীকালে কেরানি তৈরির উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে শিক্ষার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্যের সুবিধার্থে বৃহৎ 'বাংলা' প্রেসিডেন্সিকে ভেঙে দুটি আলাদা প্রদেশে বিভক্ত করে, যা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের কারণে বাংলাভাষী ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়, যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ে ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের খেলাফত নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং ইংরেজ ও ইউরোপীয় শক্তির হাত থেকে ইসলামি খেলাফত রক্ষার্থে ভারতে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। এ সকল ঘটনার অব্যবহিতকাল পরেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে জোরদার হয় অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করে সকল ক্ষেত্রে তাদের অসহযোগিতা করা। বিদেশি পণ্য বর্জন, ইংরেজ সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সাম্মানিক উপাধি বর্জন, সরকারি অফিস-আদালত বয়কট, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করে 'জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' স্থাপন ইত্যাদি ছিল খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের মূল দাবি। এই উত্তাল সময়খণ্ডেই নজরুলের শিক্ষা-সম্পর্কিত 'জাতীয়' ভাবনার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে নানা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও অভিভাষণে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী যে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, তাতে সমগ্র ভারতবাসীরই আত্মিক সংযোগ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনায় সকল মানুষের মনেই ইংরেজবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হচ্ছিল। তাই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলিম বিশ্বের খেলাফত আন্দোলনে সদ্য যুদ্ধফেরত নজরুলের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব প্রকটভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তাঁর রচিত সাহিত্যে। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে *দৈনিক নবযুগের* সম্পাদকীয়তে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-তোষণের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করছিলেন নজরুল। *যুগবাণী* গ্রন্থের 'সত্য-শিক্ষা' প্রবন্ধে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই আন্দোলনে আহ্বান করেছেন জেগে ওঠার:

> তোরণে তোরণে ভৈরব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—'জাগো পুরবাসি!' দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে। এই যে আমাদের জীবনের উন্মাদ নট-নৃত্য, এ শুধু বিশ্বের কল্যাণ-মুক্তিতে নয়, এই মুক্তি-যুগে আমরাও আমাদের ভাবী সিংহ-দ্বারের পূর্বতোরণে নহবতের বাঁশি শুনিয়াছি বলিয়া। তাই আর আমরা শুধু দার্শনিকের ভিতরের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নই, এখন চাই বাইরের ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি। (নজরুল ২০০৬: ৪২১)

নজরুলের মতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এই জেগে ওঠা শুধু উপনিবেশবিরোধী যুক্তি বা কল্পনায় সীমিত না রেখে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বিদেশি পণ্য, বিদেশি সঙ্গ, বিদেশি উপাধি পরিত্যাগের পাশাপাশি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার যে ডাক দেওয়া হয়েছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন নজরুল। তবে ইংরেজ সরকারের প্রতি অসহযোগের সকল বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। বিজাতীয় ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করে শুধু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, এই 'জাতীয় চেতনা' তথা ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তিমন্ত্র ধারণ করতে হবে অন্তরেও। আন্দোলনের এই সময়ে এসে ইংরেজ প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে এখন 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে, তা অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন অসহযোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে যেনতেনভাবে 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা উচিত হবে না। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সমন্বিত নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাই পারে বিদেশি শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করতে; কারণ ঔপনিবেশিক ছায়াতলে থেকে আমাদের নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা সবই লুপ্ত হয়েছে। নজরুলের মতে:

> আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন-প্রকারণে দুই-একটা ঠাটকবাজি-গোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়; অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। (২০০৬: ৪২১)

বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ত্যাগ করে 'জাতীয় চেতনা'য় তৃণমূল-সংলগ্ন শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চার দিকেই মূল আলোকপাত করেছেন নজরুল। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির চেয়ে সেই প্রতিষ্ঠানে এত দিন ধরে চলে আসা বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস চর্চা থেকে মুক্ত হওয়াই আসল চ্যালেঞ্জ। কারণ প্রায় দুই শতকের বিজাতীয় শাসন-শোষণে হারিয়ে গেছে আমাদের নিজস্ব চেতনা, জাতীয় মূল্যবোধ। তাই 'জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন' (নজরুল ২০০৬: ৪২১) গঠন করতে হবে। কারণ যারা ভবিষ্যতে জাতির হাল ধরবে, আগে তাদেরকে দেশপ্রেমের ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হতে হবে। ভবিষ্যৎ কান্ডারি এই তরুণদের জানতে হবে জাতির ইতিহাস, গৌরবময় ঐতিহ্য, স্বজাতির আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মর্ম। তবেই এই তরুণ দলের মাধ্যমে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মহাশিক্ষার আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে পড়বে সারা ভারতবর্ষে। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেয়েও নজরুলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তরুণ প্রজন্মের মনে-প্রাণে জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। তবেই ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে জাতি কিছুটা হলেও মুক্ত হতে পারবে।

শিক্ষা-সম্পর্কিত নজরুলের এই চিন্তাকে 'উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বে'র আলোকেও বিশ্লেষণ করা যায়। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী নিজেদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য

ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয় উপনিবেশিত দেশগুলোর উপর। ফলে একসময় কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় উপনিবেশিত দেশের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা। এতে ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ও শাসনকার্য পরিচালনা আরো সহজ হয়। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চেতনাই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের মূল বিষয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী মুখোশ উন্মোচন করে নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা ও পুনর্জন্মের মাধ্যমেই নিজস্ব সত্তা ফিরে পাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে। আত্মপরিচয় সন্ধানে এবং প্রতিরোধের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের বাসনায় উপনিবেশিত মানুষ বিশেষত সৃষ্টিশীল প্রতিভা মিথ-পুরাণ-রূপকথা-উপকথাকে অবলম্বন করে নির্মাণ করে নবতর এক জীবন সংবেদ—মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের ঘটে নবজন্ম (বিশ্বজিৎ ২০১৭: ৩৩৫)। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তথা চিন্তাচেতনা থেকে মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় নিজের শিকড়ের অনুসন্ধান করা—শিকড়ে ফিরে যাওয়া। শিকড়ে ফিরতে পারলেই তবে নিজস্ব সত্তা-অস্তিত্বকে ফিরে পাওয়া সম্ভব। তাই নজরুল 'দেশের কাহিনী', 'জাতির বীরত্ব', 'ভ্রাতার পৌরুষ', 'স্বধর্মের সত্য', 'বীরের আত্মোৎসর্গ', 'কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম' প্রভৃতির মাধ্যমে তরুণ দেশসেবকদের জাগ্রত করে তুলতে চান। জাতির প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বুকে লালন করে এবং বাস্তবজীবনে পালন করেই তরুণদের জীবনে 'মহাশিক্ষার প্রাণ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই এই তরুণ-তুর্কিদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোকে বর্জন করে 'জাতীয় শিক্ষা' প্রচলন করা সম্ভব হবে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আমাদের 'জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা' প্রবর্তন ও প্রচলনের ক্ষেত্রে তরুণদের উপরেই অধিক ভরসা করতে চান নজরুল। কারণ একটি প্রচলিত ধ্যান-ধারণাযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে নতুনভাবে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে গেলে তরুণদের পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

'জাতীয় শিক্ষা' প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক সংস্কার প্রত্যাশা করেছেন নজরুল। তিনি বিশ্বাস করেন, ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তা আমাদের জাতি হিসেবে স্বাধীন চিন্তাচেতনার অন্তরায়। আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে পড়ানো হচ্ছে বিদেশি কৃষ্টি-কালচার ও ইতিহাস—এতে করে আমাদের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের উত্তাল পরিস্থিতিতে সারা দেশে ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 'জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠার জন্য যে জনজাগরণ তৈরি হয়, এতে নজরুল আনন্দিত হলেও কিঞ্চিৎ শঙ্কিত ছিলেন। কারণ আমাদের অতীত ইতিহাস সুখকর নয়। ইতিপূর্বে স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে বিদেশি পণ্য বর্জনের ক্ষেত্রে একশ্রেণির ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল বিদেশি পণ্যের গায়ের ট্রেডমার্ক তুলে স্বদেশি মার্কা লাগিয়ে। এখন এই জনআন্দোলনের সময়ে বিদেশি-ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করে স্বদেশি 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য ঢালাওভাবে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সরকারি বিদ্যালয় ও তাদের প্রবর্তিত বিদেশি শিক্ষা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না নজরুল। তাঁর মতে:

> কথায় বলে, 'টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলে বাসা।' আজকাল 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা' বলিয়া যে একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে দেশে, ইহার প্রতিও উক্ত

> ব্যঙ্গোক্তি দিব্যি খাটে! সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয় হয় বলিয়াই যদি আমরা তাহাকে তালাক দিই, তাহা হইলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিপুষ্টির জন্য বা মনের মতো শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যাপীঠ খাড়া করিয়াছি বা করিব, তাহা কিছুতেই ঐ সরকারি বিদ্যালয়েরই নামান্তর বা রূপান্তর হইবে না। তাহা হইলে টকের ভয়ে আমরা বৃথাই বাঁধা বাসা ফেলিয়া পলাইয়া আসিলাম, কেননা আবার আমাদের আর এক রকম 'টকবৃক্ষ'-এরই ছায়াতলে আশ্রয় লইতে হইল। (২০০৬: ৪২৩)

সরকারি বিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষায় আমাদের বিদ্যা 'লয়' হয়—এটা যেমন সত্যি, তেমনি এ কারণে সরকারি বিদ্যালয় ও বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে যেনতেন প্রকারে 'জাতীয় শিক্ষা' চালু করাটাও বোকামি। কারণ জাতীয় শিক্ষার নামে যদি পূর্বে প্রচলিত ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়, তাহলে এতে প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবর্তনই হবে না। তাই সম্পাদক-প্রাবন্ধিক নজরুল চেয়েছেন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার। তা না হলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী এই বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের মন-মগজ নষ্ট করে দেবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে আমাদের দেশের উপযোগী, আমাদের আবহাওয়ার উপযোগী—আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এতে যুক্ত থাকবে ওতপ্রোতভাবে। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পণ্ড হয়েছিলো শুধু এ কারণেই। তা সাফল্যের মুখ দেখেনি, এই কারণে যে, শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনে, তা যে কোনো ধরনেরই হোক, অন্তর সত্যের সম্পূর্ণতর পরিবর্তন কিংবা নবতর বিকাশ অসম্ভব। এজন্য অভ্যন্তর পরিবর্তন সংঘটনের বিষয়টিও জরুরি। (জামরুল ২০১৭: ৩২৭)

'জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা' প্রবর্তনের এ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন নজরুল। নজরুল উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন শিক্ষার প্রকৃত সংস্কারের ক্ষেত্রে সঠিক ও যোগ্যতম শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত ভারতবর্ষের মানুষের বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই 'জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'গুলো মুখ থুবড়ে পড়বে—পৌঁছাতে পারবে না নির্দিষ্ট গন্তব্যে। তাই জাতীয় বিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত অনেকেই একসময় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সরব ছিলেন। কিন্তু নজরুলের মতে, আন্দোলনে যুক্ত থাকাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির মাপকাঠি হতে পারে না। শুধু রুটি-রুজির উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই নব্য প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন শিক্ষক হিসেবে। নিয়োগ-কর্তৃপক্ষও সঠিকভাবে যোগ্যতা যাচাই না করে যেনতেনভাবে সমাধা করেছেন শিক্ষক নিয়োগের কাজ—পাশাপাশি শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে অযুহাত দেখিয়েছেন 'যোগ্য শিক্ষকের অভাব'। শিক্ষক নিয়োগের এসব বিষয়ে হতাশ ও রুষ্ট ছিলেন নজরুল। এসব নিয়োগকার্যে যারা যুক্ত ছিলেন এবং নিয়োগ পেয়েছেন শিক্ষক হিসেবে, যথাসময়ে তাদের মুখোশ উন্মোচনেরও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে নজরুলের মন্তব্য নিম্নরূপ:

> যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রফেসর বা অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই কি নিজ নিজ পদের উপযুক্ত? কত উপযুক্ত লোককে ঠকাইয়া শুধু দুটো বক্তৃতা ঝাড়ার দরুন ইহারা অনেকেই নিজের রুটির যোগাড় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। আজ আমরা তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এখনো এই রকম ব্যাপার চলিতে থাকে, তবে বাধ্য হইয়া আরো অনেক অপ্রিয় সত্যকথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। পবিত্রতার নামে মঙ্গলের নামে

> এমন জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ একদম ফর্সা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা দেশের লোক কতকগুলি ভূতের বাথান ও আখড়া পাকাইবার জন্য বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন ইংরেজি মেম-ভারতীয় জুতো-পরা পায়ে নয়, বাগদেবী ভারতী-বীণাপাণির কমল পায়ে। এর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া 'খোঁড়া ওজর' দেখাইলে চলিবে না, তাঁহারা ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কি? (২০০৬: ৪২৪)

বর্তমান সময়েও নজরুলের এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষপূর্বে শিক্ষক নিয়োগের যে অসঙ্গতি চিহ্নিত করে গেছেন নজরুল, বর্তমানেও আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনাচার পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হয়ে যায় অন্ধ দলীয় অনুকরণ, স্বজনপ্রীতি, অবৈধ আর্থিক লেনদেন প্রভৃতি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবী যোগ্যদের নিয়োগ দিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতি গড়ার আসল কারিগর হিসেবে কাজ করতে পারবে।

'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে নজরুল 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা ও 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনে যেসকল ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলো শোধরানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নজরুল এই প্রবন্ধেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ ও শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত নানা সমস্যার দিকে আলোকপাত করেছেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে যে ধরনের ভুল হয়েছে, সে ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে প্রথম দিকে নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে—নজরুল চেয়েছেন এই ধরনের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যেন পরবর্তীকালে তার সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভুলকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিতে রাজি নন তিনি। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে পূর্বের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলোতেও নানা সমালোচনা করেছেন নজরুল। বর্তমান প্রবন্ধেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক নিয়োগের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর মতে:

> প্রথম কোনো বড় কাজ করিতে গেলে অনেক রকম ভ্রম-প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক জানি, এবং তাহাকে ক্ষমা করিতেও পারা যায়—যদি জানি যে তাঁহারা জানিয়া ভুল করিতেছেন না। কিন্তু যদি দেখি যে, এই সব হোমযজ্ঞের হোতারা জানিয়া-শুনিয়া ভুল করিতেছেন বা জাতীয় শিক্ষা-রূপ পবিত্র জিনিসের নামেও নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছেন, তাহা হইলে হাজার অপ্রিয় হইলেও আমাদিগকে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। পবিত্র কোনো জিনিসে কীট প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকাও অপরাধ। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক নিয়োগ লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না; 'মাছ দিয়া শাক ঢাকা যায় না'। (২০০৬: ৪২৫)

বয়সে কাঁচা নয়, বিদ্যা ও যোগ্যতায় কাঁচা অধ্যাপকদের নিয়োগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত নজরুল। প্রকৃত যোগ্য ও দেশপ্রেমিক শিক্ষকের অভাবে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত নবপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই নতুন 'জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা' রক্ষা করতে ও সঠিক পথে রাখতে শিক্ষক নিয়োগের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই অপকর্ম দেখেও চুপ করে থাকা

তাঁর মতে অপরাধতুল্য। শুধু স্বার্থের জন্য ও ব্যক্তিগত লাভের আশায় যাঁরা জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের জঞ্জাল হিসেবে অভিহিত করেছেন নজরুল এবং অবিলম্বে এই জঞ্জাল সাফ করতে না পারলে জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠার পরে শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি কারিকুলামকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোন পদ্ধতিতে চলবে, তাতে কী পড়ানো হবে, কীভাবে পড়ানো হবে—এসব বিষয় একটি নির্দিষ্ট কারিকুলামের মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হয়। কিন্তু উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কারিকুলাম নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। ঔপনিবেশিক ও বিদেশি আগ্রাসন থেকে মুক্ত হতে হলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা তথা কারিকুলামও আমাদের জাতীয় 'স্ট্যান্ডার্ড' বজায় রেখে তৈরি করতে হবে। শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনে আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করে আমাদের নিজস্ব জাতিসত্তাসম্পৃক্ত তৃণমূলসংলগ্ন স্বদেশি কারিকুলামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি-নির্ভর এবং আমাদের দেশের উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। তবেই বিদেশি ঔপনিবেশিক আগ্রাসী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমাদের দেশ-জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া নজরুলের মতে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে তা যেন আমাদের দেহ ও মন তথা প্রাণশক্তি ও জীবনীশক্তিকে একীভূত করতে পারে। এ বিষয়ে প্রবন্ধকারের ভাষ্য:

> আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। 'মেদা-মারা' ছেলের চেয়ে সে হিসাবে 'ডানপিটে ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের 'জান' থাকে না; আর যাহার জান নাই, সে 'মোর্দা' দিয়া কোনো কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে—প্রাণ-শক্তি আর কর্ম-শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। (নজরুল ২০০৬: ৪২৬)

আমাদের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জনসম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থাই পারবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক ও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। বিদেশি কারিকুলাম পরিত্যাগ করে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে' স্বদেশি কারিকুলামের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'প্রাণশক্তি' ও 'জীবনীশক্তি'র মেলবন্ধন ঘটলে জাতি মুক্ত হতে পারবে পরাধীনতার রাহুগ্রাস থেকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা, কারিকুলাম ও রীতিপদ্ধতি বিষয়ে কয়েকজন প্রথিতযশা সমালোচকের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

> ১. আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। ('ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. ইংরাজের সাম্রাজ্যে শাসনকার্য যন্ত্রে চলে। এ দেশে ইংরাজ-প্রবর্তিত শিক্ষাকার্যও যন্ত্রে সম্পাদিত হয়। ছাত্রের পিতা বা অভিভাবক যথাসময়ে বালককে কলে ফেলিয়া আসেন; কিছুদিন পরে কল হইতে বাহির করিয়া লয়েন। বালক যখন কল হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার ললাটপটে 'শিক্ষিত' শব্দ যদি অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—পরিশ্রম ও ব্যয় বিধান সার্থক হইয়াছে; বালকের মন-শরীরের অভ্যন্তরে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না, দেখিয়া লওয়া অনাবশ্যক। ('শিক্ষাপ্রণালী'; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

৩. ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষে শিক্ষার দুইটি পথ হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো—ধর্মাশ্রয়ী উচ্চকোটির শিক্ষা, এবং কেবল ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী নিম্নকোটির শিক্ষা। এমন সময়ে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ এ দেশের রাজা হইয়া বসিল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বাঙালীকে ইংরেজের সঙ্গে জুটিতে হইল, অর্থকরী শিক্ষারূপে ইংরেজের ভাষাশিক্ষা বাঙালী সমাজের একটা অংশকে আকৃষ্ট করিল। যুগধর্মও বদলাইয়া যাইতেছিল—এই নবীন বিদ্যা প্রথমটায় অর্থকরী বিদ্যারূপে দেখা দিয়া, সমগ্র দেশের মানসরাজ্যে একটা বিপ্লব আনিয়া দিল। ('শিক্ষা-সংকট'; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

বিখ্যাত এই সমালোচকদের বক্তব্যেও এটা স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতি কোনোভাবেই ভারতবর্ষের উপযোগী ছিল না। প্রাবন্ধিক নজরুল তাই তাঁর 'জাতীয় শিক্ষা'-ভাবনায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভারতবর্ষের উপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম-পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিন

নজরুলের 'জাতীয় শিক্ষা'-ভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীশিক্ষা। নারীজাতিকে শিক্ষার আলো থেকে অন্ধকারে রেখে কোনো জাতিই এগিয়ে যেতে পারে না। একটি জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

> যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজেদের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়। (২০২৪: ৩৫)

নারীজাতির অনুপ্রেরণা ও সহায়তার কারণেই পুরুষরা আজ বিশ্ববিজয়ী হতে পেরেছে—পৃথিবীব্যাপ্ত মনুষ্যজাতির সামগ্রিক অগ্রগতির পেছনে নারীজাতির অবদান কোনো অংশেই কম নয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ে ভারতে নারীদের শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। নজরুল তাই চেয়েছেন নারীদের অন্তঃপুর থেকে বের করে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৫-৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে নজরুল যে অভিভাষণ প্রদান করেন তা পরবর্তীকালে 'তরুণের সাধনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণে নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন নজরুল। নারীকে অন্ধকারে রেখে সমাজের সকল হিস্যা থেকে বাদ দিয়ে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে

না। তাই আমাদের সত্যিকারের জাগরণ ও উন্নতির জন্য নারীজাতিকে অন্ধকার অন্তঃপুর থেকে বের করে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নজরুলের মতে:

> আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষাপোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ... কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। (২০০৮: ১১)

তৎকালীন সময়ে মুসলমান সমাজেই নারীরা বেশি অবহেলিত ছিল। ধর্মরক্ষা ও পর্দাপ্রথার অজুহাত দিয়ে দিনের পর দিন নারীদের বন্দী করে রাখা হয়েছে ঘরের অন্তঃপুরে। এখন সময় হয়েছে ধর্মীয় সংস্কার ও সংকীর্ণতাকে পেছনে ফেলে এই অবরোধবাসিনী নারীদের উদ্ধার করা। নজরুল উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন আগামী প্রজন্মকে সমাজে ও রাষ্ট্রে যোগ্য ও উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম দরকার নারীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা। একজন শিক্ষিত মায়ের পক্ষেই সম্ভব তাঁর সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে আগামীর সেনাপতি হিসেবে গড়ে তোলা—যাদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিক পরাশক্তির পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে ভারতবাসী। তাছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে, বিশ্বের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে অবদান রাখতে হবে—এজন্য নারীশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

একই অভিভাষণে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েও নজরুল তাঁর নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ করেছেন। শুধু চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষালাভ, নজরুল সেই শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলতে নারাজ। নজরুলের মতে, চাকুরি লাভ তথা শুধু অর্থ উপার্জন নয়, জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি চর্চাই শিক্ষালাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। শুধু অর্থোপার্জনের চিন্তা না করে সঠিক জ্ঞানচর্চা করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে—দেশ পাবে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, মননশীল, সাহসী ও দেশপ্রেমিক ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্ম। তৎকালীন সময়ে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তরুণ-যুবকরা শিক্ষিত হয়ে দেশ-জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও মুসলিম তরুণরা এ থেকে ঢের পিছিয়ে ছিল। মুসলিম তরুণদের উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া শেষ করে কোনোক্রমে একটি চাকরি যোগাড় করে সংসার-ধর্মে মনোনিবেশ করা—দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার কোনো উদ্দেশ্য বা চিন্তা তাদের মনে ছিল না। মুসলিম তরুণদের শিক্ষালাভের এই উদ্দেশ্যকে ব্যঙ্গ করেছেন নজরুল:

> আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপাড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টে'র মতো আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মতো

> হা করিয়া চাহিয়া আছি। বিএ, এমএ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই—অন্তত সাবরেজিস্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি- তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহিদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। (২০০৮: ১৩)

নজরুল মুসলিম তরুণ সমাজকে শুধু চাকুরি বা অর্থের মোহে শিক্ষালাভের চিন্তা না করে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনের মোহমন্ত্র গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও' শীর্ষক সভাপতির অভিভাষণেও নজরুল মুসলিম তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন আর্ত-পীড়িত, যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে নিমজ্জিত স্বজাতিকে বিপদসংকুল অবস্থা থেকে উত্তরণের। মুসলিম জাতিকে অন্ধকারের এই করাল গ্রাস থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় সঠিক ও উপযুক্ত শিক্ষালাভ করা। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষালাভের মাধ্যমেই একটি জাতির দেহ ও মনের আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। এ বিষয়ে নজরুলের বক্তব্য:

> আর্ত-পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ করছে—কে করবে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দ্বীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে আলো দেখাও। তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গড়ে তোল পুলসেরাত—সেই পুলের উপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নূতন জাতি। তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জন, যদি তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন। নওকরির জন্য, দাসখত লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়। (২০০৮: ২৬)

নজরুলের মতে, যে শিক্ষা দেশ ও জাতির কোনো কাজে লাগে না, যে শিক্ষার মাধ্যমে অন্ধকারের গহীনে নিমজ্জিত জাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না—সেই শিক্ষার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ঔপনিবেশিক কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে যে 'জাতীয়' শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেখানে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জ্ঞান-মুক্তবুদ্ধি-মননশীলতার চর্চা করা এবং জাতি ও রাষ্ট্রের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন করা। এই অভিভাষণেও নজরুল মুসলিম নারীদের দুর্দশার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে তরুণদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন এর প্রতিকারের:

> তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার—তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা—যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দূরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি আজো তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো

> জন্মেও এ জাতির আর মুক্তি হবে না। তারও আগে তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। (২০০৮: ২৭)

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা—বিশেষ করে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা কূপমণ্ডুক চিন্তাচেতনা। মুসলমান তরুণরাই পারবে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হয়ে নারীজাতিকে উদ্ধার করতে। এজন্য মুসলিম তরুণদের প্রথমে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীশিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলন করতে হবে।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম যে অভিভাষণ প্রদান করেন তা পরবর্তীকালে 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' নামে প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণে নজরুলের শিক্ষাভাবনার একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল কামনা করেছেন 'ইসলামাবাদ' তথা চট্টগ্রাম 'ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান' হিসেবে গড়ে উঠুক—যেখানে সারা বিশ্ব থেকে 'তীর্থ-যাত্রী' বা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগীরা এসে মিলিত হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতনে'র মতো একটি আদর্শ শিক্ষালয় তৈরি করা ছিল নজরুলের স্বপ্ন। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রচলিত শিক্ষাদানের রীতির বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন—যেখানে শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত স্থানে গাছের ছায়ায় বসে প্রাচীনকালের আশ্রমের মতো করে মনের আনন্দে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, কৃষি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনসহ আরো নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকে। নজরুল শান্তিনিকেতনের মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে চান পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে—এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগীদের মাধ্যমে। এ বিষয়ে নজরুলের ভাবনা:

> প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক—ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমি, জামি, শমশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওয়াতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকির মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন। আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। (২০০৮: ২২)

নজরুল 'কালচারাল সেন্টার'কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে সার্টিফিকেট-নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও ইতিহাস-ঐতিহ্য সমন্বিত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্ম সত্যিকারের মননশীল শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনারও পরিবর্তন ঘটবে।

নজরুলের শিক্ষাভাবনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ভাষাশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন। মাতৃভাষার পাশাপাশি যদি অন্যান্য ভাষা রপ্ত করা যায় তাহলে বিশ্বসভ্যতার অনেক কর্মেই এগিয়ে থাকা সম্ভবপর হয়। বিশেষ করে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা লক্ষ করেছেন নজরুল। মুসলমানদের অন্য জাতিসত্তার তুলনায় পিছিয়ে পড়ার এটাও অন্যতম কারণ। একসময় ভারতীয় উপমহাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সংগীতে মুসলমানদের অবদান কোনো অংশেই কম ছিল না। পরবর্তীকালে তারা যেমন এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে, পাশাপাশি বিস্মৃত হয়েছে তাদের

এই অবদানের কথা। মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় যেমন পিছিয়ে পড়েছে, ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও তথৈবচ। তাই নজরুলের মতে:

> কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেয়াল টপকাবার জন্য আগে ভালো করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি! কাজেই ন মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা 'পড়ে ফার্সি বেচে তেল'। আর তাদের অনেকেই শেখেন হালুয়া-রুটির জন্য। (২০০৮: ২৩)

আগে মাতৃভাষা ভালোভাবে রপ্ত করে তবেই অন্যান্য ভাষাশিক্ষায় মনোনিবেশ করা উচিত। এতে করে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় জানা ও জ্ঞানার্জন যেমন সহজ হয়, তেমনি নিজ নিজ সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস, ঐতিহ্য-সাহিত্যকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

বাংলার সাধারণ জনগণকে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়েও আলোকপাত করেছেন নজরুল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন-সাহিত্য সংসদের শুভ উদ্বোধনে 'জন-সাহিত্য' নামে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন নজরুল। এ বক্তৃতায় নজরুল বলেন, সমাজের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মজুর প্রভৃতি শ্রেণির মানুষকে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার উপায় হচ্ছে তাদের উপযোগী ও মনমতো করে সাহিত্য রচনা করা। এ ধরনের সাহিত্যকেই নজরুল অভিহিত করেছেন 'জন-সাহিত্য' নামে। জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের সৃষ্টি করা (নজরুল ২০০৮: ২৮)। বক্তৃতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমাজের এ সকল জনশ্রেণির মধ্যে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; তাই সাহিত্য রচনা করতে হবে তাদের মনের মতো করে, তাদের কথা দিয়ে। সাহিত্যের মধ্যে তারা নিজেদেরকে দেখতে পেলে তারা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হবে সাহিত্যের প্রতি—পরবর্তীকালে 'জন-সাহিত্যে'র মাধ্যমে তাদেরকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সহজ হবে।

চার

নজরুলের প্রায় সকল প্রবন্ধই সমকালীন নানা বাস্তবতার প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। কখনো পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসেবে, কখনো বা কোনো অনুষ্ঠানের সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতিকে মুক্তির বার্তা দিতে আজীবন লেখনি পরিচালনা করেছেন নজরুল। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে এ বার্তার ছাপ স্পষ্ট। তবে তাগাদা বা নানা প্রয়োজনে রচিত বলে প্রবন্ধগুলো হয়েছে খর্বকায় এবং সময়াভাবে অযত্ন-বিন্যস্ত। নজরুলের প্রবন্ধগুলো মননশীলতার অভাবহেতু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ এবং উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে কণ্টকিত। তবে তাঁর ভাষার পৌরুষ ও অকৃত্রিম ভাবাবেগে অনেকস্থলেই চমৎকৃত হতে হয় (সুশীল ২০০৭: ২৮৭)।

নজরুল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁর 'জাতীয় শিক্ষা'-ভাবনা প্রকাশ করেছেন সমকালীন জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের জন্য যে জন-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল তার

পরিপ্রেক্ষিতে। নজরুল ছিলেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশ-কাল-স্বজাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-জীবন-সংস্কৃতিসংলগ্ন শিক্ষাব্যবস্থাই পারবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে। এজন্য তিনি তাঁর শিক্ষাভাবনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও তৃণমূল-সংলগ্ন শিক্ষাব্যবস্থার দিকে যেমন গুরুত্বারোপ করেছেন, তেমনি সমকালীন 'জাতীয় বিদ্যালয়ে'র কারিকুলাম, বুদ্ধিবৃত্তিক-মননশীল শিক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি ও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। নজরুলের এই সমকালীন 'জাতীয় শিক্ষা'-ভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জাতি হিসেবে আবির্ভূত হলেও আমাদের শিক্ষাকাঠামোর মধ্যে এখনো ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ছাপ রয়ে গেছে। নজরুলের সমকালীন জাতীয় শিক্ষাভাবনা বর্তমানেও যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

সহায়কপঞ্জি

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (২০১৭)। 'নজরুলের প্রবন্ধ: বিষয়বৈচিত্র্য ও গদ্যশৈলী', *সৃষ্টি সুখের উল্লাস* দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৬)। *নজরুল-রচনাবলী* প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১১)। *নজরুল-রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* অষ্টম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

জামরুল হাসান বেগ (২০১৭)। 'নজরুল ইসলামের শিক্ষা-চিন্তা', *সৃষ্টি সুখের উল্লাস* প্রথম খণ্ড (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৭)। 'উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য', *সৃষ্টি সুখের উল্লাস* দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

বেগম রোকেয়া (২০২৪)। 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি', *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা* ষষ্ঠ খণ্ড (শোয়াইব জিবরান সম্পাদিত)। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

শোয়াইব জিবরান (২০২৪)। 'সম্পাদকের কথা', *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা* প্রথম খণ্ড (শোয়াইব জিবরান সম্পাদিত)। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সিদ্দিকা মাহমুদা (২০১৭)। 'নজরুলের প্রবন্ধ: সমাজচৈতন্য', *সৃষ্টি সুখের উল্লাস* প্রথম খণ্ড (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

সুশীলকুমার গুপ্ত (২০০৭)। *নজরুল-চরিতমানস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং